ভূমিকা

উপন্যাস জীবনের দর্পণ। শুধু উপন্যাস কেন যে কোনো সাহিত্যই জীবনকে প্রতিবিম্বিত করে। কিন্তু উপন্যাসের গুরুত্ব এই যে, যে জীবন আমরা যাপন করি এবং যে জীবনের স্বপ্নে আমরা সর্বক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকি, তাদের মধ্যে এক সংযোগ রচনার প্রয়াস করে উপন্যাস। অর্থাৎ আমাদের বাস্তব জীবন শুধু চিত্রিত হয় না উপন্যাসে, বাস্তব জীবনের পাশাপাশি ধরতে না-পারা পলায়নমুখী যে জীবনের বিস্তার — উপন্যাস সেই জীবনকেই ধরার চেষ্টা করে হয়ে ওঠে সেই জীবনেরই শিল্পিত রূপ। লেখকের যেমন আগ্রহ সেই জীবনের প্রতি, সামাজিক মানুষ হিসেবে পাঠকেরও সমান আগ্রহ সেই জীবনের প্রতি। তাই উপন্যাস লেখক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগ-সেতু তৈরি করে হয়ে ওঠে এক সামগ্রিক জীবনের ভাষ্য। বাস্তব জীবনের যে সামগ্রিকতাকে আমরা ধরতে পারি না, উপন্যাসে তারই মুখোমুখি হওয়ার প্রয়াস পাই। আধুনিক মানুষ শুধু অনুভূতি নয়, শুধু কর্ম নয়, যখন এ সবেরও উপরে সমাজ ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে অথবা নিছক ব্যক্তির নিজস্ব আত্মিক সংকটে বিদীর্ণ হতে শুরু করল, উপন্যাসের জন্ম সেই মহালগ্নে। তাই উপন্যাস বার বার ধাক্কা দিয়েছে মনের গহন অন্দরে, খুঁজে নিয়েছে ব্যক্তিত্বের বহুমুখী দ্বন্দ্বকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫ খ্রিঃ) থেকেই সেই প্রয়াস আমরা দেখতে পাই। বন্দী পিতৃশত্রুকে আয়েষা যখন প্রাণেশ্বর বলে উল্লেখ করে, তখনই তার ব্যক্তিত্বের বহুমুখী দ্বন্দ্ব যেমন স্পষ্ট হয়, তেমনি কপালকুণ্ডলার আত্মবিসর্জন, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু, রোহিণীর তীব্র জীবন-সংযোগ, কারাগারে গোরার আত্মোপলব্ধি, বিনোদিনী-অচলার শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ একাকীত্বের যন্ত্রণা — সেই দ্বন্দ্ব এবং তার পরিণতিকেই স্পষ্ট করে।

জীবন মানেই নানাবিধ সম্পর্কের ওঠাপড়া, নানা সম্পর্কের আসা-যাওয়া। — এই বহুধা বিস্তৃত ও ব্যাপ্ত সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে জটিল, সবচেয়ে দ্বান্দ্বিক অথচ প্রায় অপরিহার্য সম্পর্ক সম্ভবত দাম্পত্য-সম্পর্ক। জীবনের সমগ্রতার সন্ধানে এগিয়ে চলা উপন্যাসেও নানা ভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছে এই সম্পর্কের জটিল গভীর রূপ। বাংলা

উপন্যাসে কীভাবে বিস্তার পেয়েছে এই সম্পর্কের গভীরতা, কীভাবে মূর্ত হয়েছে এই সম্পর্কের হাসি-কান্না, আনন্দ-যন্ত্রণা বিদীর্ণ রূপ —— আলোচ্য গবেষণা-অভিসন্দর্ভে তারই বিশ্লেষণে আমরা প্রয়াসী হয়েছি। 'মনস্তত্ত্বের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা' শীর্ষক আমাদের গবেষণা সন্দর্ভে এই বিষয়ে আলোকপাত করতে চেয়েছি। বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য সংকটের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, সে বিষয়ে মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা যে কোথাও কিছু হয়নি এমন নয়। কিন্তু সেসব আলোচনা-সমালোচনায় সম্পূর্ণভাবে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার প্রযত্ন আমাদের চোখে পড়েনি। তাই বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে সেই অসম্পূর্ণতা দূর করে বিষয়টির একটি স্পষ্ট পূর্ণ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হব। উপন্যাস আধুনিকসভ্যতার দান। সেই আধুনিকতা ব্যক্তি ও সমাজের এবং ব্যক্তির নিজস্ব আত্মিক সংকট ও দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। আমাদের বর্তমান সন্দর্ভে এর সঙ্গে মনস্তত্ত্বের গভীর সংযোগ দেখানোর চেষ্টা থাকবে। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের শৈল্পিক ও ঐতিহাসিক সূচনা পর্ব থেকে তিনজন মুখ্য ঔপন্যাসিক —— বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের উপন্যাসকে অবলম্বন করে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব দাম্পত্য সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক কারণ ; দেখব দাম্পত্য-সংকটের চিত্র কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁদের উপন্যাসে ; কীভাবে তা কাহিনি ও চরিত্রের পরিণতির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক বা দিক-নির্দেশক হয়ে উঠেছে।

সমাজবীক্ষা ও অনুসন্ধানে তৎপর হয়ে আমরা দেখেছি বঙ্কিম-উপন্যাসের দাম্পত্য-সংকটের মূলে রয়েছে নায়কের রূপজ মোহ এবং গুরুতর সামাজিক সমস্যা, রবীন্দ্রনাথে এই সঙ্কটের চেহারা বিবর্তিত হয়ে দাঁড়ালো ব্যক্তিত্ব ও রুচিবোধের দ্বন্দ্বে, শরৎচন্দ্রে তা পরিণতি পায় সমাজ-বিধৃত ব্যক্তির সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্যে। —— এই তিনজন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস রচনার কালপর্বে সময় বদলেছে আশ্চর্য গতিতে। বদলেছে চরিত্রের সামাজিক অবস্থান, তার অর্জিত চেতনা। তার ফলে দাম্পত্য-সম্পর্কের বিন্যাসও গেছে বদলে। কী সেই পরিবর্তন? কোথায় তার স্বকীয়তা; কোথায় তার গূঢ় জটিলতা এবং কোথায় তা

জীবনের যথার্থ ভাষ্য — বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে এই সব বিষয়ে বিস্তারিত ও অনুসন্ধানী বিশ্লেষণ থাকবে।

'মনস্তত্ত্ব' একটি আধুনিক চর্চার বিষয়। উনিশ শতকে জার্মান মনস্তত্ত্ববিদ গুস্তাভ ফেকনার (১৮০৩ খ্রিঃ -১৮৮৭ খ্রিঃ) মনস্তত্ত্বকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তবে ঐ শতকে মনস্তত্ত্বের ধারণা তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। মনস্তত্ত্বের প্রচার ও প্রসার ঘটে বিশ শতকের সূচনায় সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েডের (Sigmund Freud) 'The Interpretation of Dreams' (১৯০০ খ্রিঃ) ও Psycho-pathology of Everyday life (১৯০৪ খ্রি.) প্রকাশিত হলে। ফ্রয়েড তাঁর গ্রন্থে জানান, মানুষ তার মনের কারখানা ঘরেরও মালিক নয়। মানুষের মনের চেতন অংশ হল সমগ্র মনের খন্ডাংশ মাত্র। শুধুমাত্র চেতন স্তরের মাধ্যমে ব্যক্তিমনের সমগ্ররূপের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি তাঁর মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে মনের আরো দুটি স্তরের কথা জানান — অবচেতন বা প্রাক্‌চেতন (Pre-conscious or Sub-conscious level) ও অচেতন বা নির্জ্ঞান অংশ (Uconscious level)। মনের ঐ দুটি স্তরের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে ব্যক্তির মানসিক রোগ ও আচার-আচরণের অসঙ্গতির কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি জানান যে, বাল্য ও কৈশরের যেসব কামনা-বাসনা চরিতার্থ হতে পারে না, তারা মনের নির্জ্ঞান গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেয়, কখনোই বিলুপ্ত হয় না। মনের অবরুদ্ধ ও অসামাজিক কামনা-বাসনা সুযোগ পেলেই বিভিন্ন ছদ্মবেশে বা বিকৃত রূপে চেতন স্তরের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ভুলভ্রান্তি, অগোচর আবেগ, স্বপ্ন, মুদ্রাদোষ, মনোরোগ ও মানসিক বিকৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেন।

বিশ শতকের চিন্তা জগতে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা মনের গোপন রাজ্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকেরা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে পাত্র-পাত্রীর আচার-আচরণ, তাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে থাকেন। উপন্যাসে ঘটনা-প্রাধান্য হ্রাস পায়, চরিত্রায়নের প্রাধান্য দেখা যায়। অষ্টাদশ

শতকে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলা' (১৭৪০ খ্রি.) রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে সাধারণ মানুষের স্বীকৃতির প্রকাশ ঘটেছিল। উপন্যাসটিতে রাজা-রাজড়ার কাহিনি নয়, একজন সাধারণ দাসীর সুখ-দুঃখ ভরা জীবনকথা অকপটে প্রকাশিত হয়। বিশ শতকে মনস্তত্ত্বের প্রসারের ফলে উপন্যাস-শিল্প আরো অনেকদূর এগিয়ে যায় — উপন্যাস মানব-স্বীকৃতি থেকে বিবর্তিত হয়ে মানব-মনের স্বীকৃতির স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। বিশ শতকের পূর্বে ঔপন্যাসিকেরা উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে মনের উপরি স্তরের আবেগ-অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিতেন। পাত্র-পাত্রী হৃদয়াবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে যে সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম সংঘটিত করত , উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনায় তাদের ফুটিয়ে তুলতেন। বিশ শতকে মন-সম্পর্কিত ধারণা বদলে যায়। মন বলতে ঔপন্যাসিকেরা চেতন মনের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় গোপন মনকেই বুঝতে শুরু করেন। চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা চেতন-উর্ধ্ব মনের গভীরতম প্রদেশের নিগূঢ় প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদানের কথাই ভাবলেন। তাঁরা উপলব্ধি করলেন, পাত্র-পাত্রীর বাহ্য ক্রিয়া-কলাপে তাদের সমগ্র পরিচয় ধরা পড়ে না। ঐ সব ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতে যে সব আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি সক্রিয় থাকে, চরিত্রের সম্পূর্ণায়নের জন্য তাদের পরিচয় ও প্রকাশিত হওয়া দরকার। তাই ঔপন্যাসিকেরা নির্জ্ঞান মনের অবদমিত আবেগ-অনুভূতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা আনার জন্য 'সাহিত্যিক চরিত্র' সৃষ্টিতে উদ্যোগী হন। 'সাহিত্যিক চরিত্র' বাস্তবে দেখা চরিত্র থেকে একটু আলাদা ধরনের। সাহিত্য-সমালোচক উজ্জ্বল কুমার মজুমদার এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন—''উপন্যাসের চরিত্র মাত্রেরই দুটি মাত্রা আছে। এক দিকে সে বাইরের জীবনের প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে সে অন্তর্জীবনের আলোড়নে আলোড়িত। এই দ্বিমাত্রিক গতিবিধি নিয়েই তার তথাকথিত 'চরিত্র' নামটি সার্থক। এই সূত্রেই 'সাহিত্যিক চরিত্র' 'বাস্তব চরিত্র' থেকে আলাদা হয়ে গেছে। জীবন যাপন বা জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বাস্তব মানুষের গতিবিধিকে ভিতরে আমরা বাইরে থেকে দেখি। আর সাহিত্যিক চরিত্রকে একই সঙ্গে আমরা ভিতরে বাইরে দেখি।'' ('চৈতন্যের গভীরে', উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা -০৯, দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা, ২০০৮, পৃ.৪৯।)

'আঁতের কথা' প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা হয় 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসটি রচনার মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'' সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।'' (চোখের বালি, সূচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮, পৃ. ২১২।)

সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসটিকে বাংলা সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন— ''চোখের বালি'-কে উপন্যাস সাহিত্যে নবযুগের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। অতি আধুনিক উপন্যাসে বাস্তবতা যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেই তাহার সূত্রপাত।'' (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, অষ্টম সংস্করণ, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৯।)

'চোখের বালি' উপন্যাসটিতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ পাত্র-পাত্রীর অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র রূপায়িত করেছেন। সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'চোখের বালি' উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—''চোখের বালি' রবীন্দ্রনাথের প্রথম শক্তিমান সৃষ্টি। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম উপন্যাসের ক্ষেত্রে সমসাময়িক সমাজের পাত্র-পাত্রীকে গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবহার করলেন। এই উপন্যাসেই তিনি প্রথম কাহিনির ভার পরিহার করে ব্যক্তিত্বের ফলস্বরূপ নানা সংকটকে উপন্যাসের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করলেন।'' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুন ১৯৮০, পৃ. ১৩৮।) এরপর বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যেও উপন্যাসে চরিত্রায়নের প্রতিই ঝোঁক দেখা যায়। আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয় 'মনস্তত্ত্বের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের বাংলা উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যা'। স্বাভাবিক ভাবেই একটা প্রশ্ন উঠতে পারে — ফ্রয়েড বা ফ্রয়েড-সমসাময়িক

অথবা ফ্রয়েড-পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীদের মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সম্পর্ক কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সঙ্গে কোনো মনস্তত্ত্বেরই তাত্ত্বিক সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয়। আমাদের বক্তব্যও তাই। তবে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ভগীরথ। বাংলা উপন্যাস তাঁর হাতেই প্রথম শিল্প-সম্মত রূপ লাভ করে। তাঁর উপন্যাস রচনার সময়কাল —১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়ে বাঙালি ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে নবজীবনরসে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই নবজীবনের উদ্‌গাতা। তিনি তাঁর সূক্ষ্ম সন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি ও অসামান্য সৃজনী প্রতিভার দ্বারা বাংলা উপন্যাসে অনেক নতুন বিষয়ের অবতারণা করে পথিকৃৎরূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন। আধুনিক উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিকতা বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলতে যা বোঝায়, প্রকৃষ্ট অর্থে তার প্রয়োগ বঙ্কিম উপন্যাসে নেই। তবে তাঁর উপন্যাসে চেতন-উর্ধ্ব মনের ইঙ্গিত রয়েছে। রয়েছে মনের দুর্জ্ঞেয় প্রদেশ সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতার পরিচয়। তিনি তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে উপন্যাসের আখ্যানে বিধৃত পাত্র-পাত্রীদের মানসিক অবস্থার দিকটি লক্ষ্য করে তাদের মানস-জগতের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ নর-নারীর দাম্পত্য-সমস্যার স্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে মনের গহন গভীরে সৃষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে উপন্যাস-শিল্প পৌঁছে গিয়েছে একটা বিশিষ্ট স্থানে।

আমরা তাই মনস্তত্ত্বের আলোচনায় বঙ্কিম উপন্যাসের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখে এবং রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে দাম্পত্য সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক কারণ আলোচনার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের আলোচনাকেও প্রাসঙ্গিক মনে করে আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মনস্তত্ত্বের প্রতি শরৎচন্দ্রের আগ্রহের কথা আমরা জানি; তিনি মনস্তত্ত্ব-সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করে পড়াশোনা করতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার কালে ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়নি, মনস্তাত্ত্বিক ধারণার বিকাশও সেইভাবে ঘটে নি। আর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাস বিশ শতকের সূচনালগ্নেই প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির রচনা শুরু হয়েছিল ফ্রয়েডের 'The Interpretation of Dreams'

(১৯০০ খ্রিঃ) ও 'Psycho-pathology of Everyday life' (১৯০৪ খ্রি.) গ্রন্থদুটি প্রকাশের পূর্বেই। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে ফ্রয়েডের প্রভাব সর্বাধিক হলেও একথা বলা যায় না যে, রবীন্দ্রনাথ ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'চোখের বালি' (১৯০৩ খ্রি.) উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে পাত্র-পাত্রীর 'আঁতের কথা' শিল্পরূপ দেন। তাই ফ্রয়েড, ফ্রয়েড়-সমসাময়িক বা ফ্রয়েড-উত্তর কালের মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে কার কোন্ তত্ত্বের প্রভাব বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের এই প্রধান তিন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যা চিত্রণের ক্ষেত্রে পড়েছে — সে বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে রাখি নি। পাত্র-পাত্রীর অবদমিত কামনা-বাসনা তথা প্রবৃত্তির প্রাবল্য, চরিত্রের অন্তর্নিহিত ঈর্ষাবোধ, হীনতাবোধের ধারণা প্রভৃতি যে সব মনস্তাত্ত্বিক কারণের জন্য উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীদের দাম্পত্য-জীবনে সমস্যা সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে সেই কারণগুলিকেই আমরা মনস্তত্ত্বের সাধারণ পারিভাষিক শব্দাবলীর সাহায্যে চিহ্নিত করে আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভে তাদের সমস্যা-সংকটের স্বরূপ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা আমাদের অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের নির্যাসকে বর্তমান গবেষণা-সন্দর্ভে নিম্নরূপ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি —

প্রথম অধ্যায় ঃ দাম্পত্য-সমস্যার স্বরূপ ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যান।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বঙ্কিম উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রবীন্দ্র উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ শরৎ-উপন্যাসে দাম্পত্য-সমস্যার মনস্তাত্ত্বিক রূপ।

উপসংহার